কৃষ্ণগোপাল মল্লিক

গোলদীঘির এইখানটা

না-পাম, না-তাল, না-খেজুর তিনটে গাছ ঠিক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর— না, যেন বড়ো-মেজো-সেজো। আর এদের কোলেই গোলদীঘির এইখানটা, যার উত্তর সীমানার মার্কা BAPTIST MISSION-এর B, আর দক্ষিণ সীমানার মার্কা HEADMASTERS ASSOCIATION-এর N। একটা ব্যাডমিন্টন কোর্টের চেয়ে সামান্য বড়ো এইখানটার উত্তরে তিনটে গাছের পাহারা আর দক্ষিণে বাধার নিরেট প্রাচীর যাতে হাত আর কাস্তে হাতুড়ি পাশাপাশি বছরের পর বছর উঁচিয়ে থাকে।

অথচ এই পাহারা আর বাধার মাঝখানেই কি বিপুল মুক্তি, অসীম আনন্দ, অনন্ত উদ্ধার!

ধরা যাক গাছগুলো তাল; তাহলে তাদের পাতা হলো তালপাতা; আর এরা হলো এইখানটার তালপাতার পাঁজি— পাতায় পাতায় লেখা আছে এইখানটার কখন কী, কবে কী। এমন কি পাঁচ দশ বিশ বছর আগে এইখানটার কখন কী, কবে কী— তাও খুঁজে পাওয়া যাবে এই তালপাতার ইয়ার-বুকে। দেখতে চাও তো এসো পূর্ণিমার নিশুতি রাতে যখন মাথার ওপর আস্ত একখানা গোল চাঁদের আলোয়— রুপোর পাতের মতো চিকণ পাতায় পাতায় তুমি সমস্তই পড়তে পারবে। পাতা খোলো। কী বেরোলো?

আষাঢ় মাস? তখন দেখা যাচ্ছে এইখানটায় যতো রাজ্যের ঢিল ঢেলা রাবিশ জঞ্জাল, খোঁচা খোঁচা খাপছাড়া ঘাস আর মানুষ আর কুকুরের টাটকা-বাসি গুয়ের ডেলা, পুব আর দক্ষিণ দিক জুড়ে পেচ্ছাপের ডোবা। ভালো লাগছে না? বেশ, আবার পাতা ওলটাও।

কী বেরোলো? চৈত্র মাস? তবে তো উটপাখির মতো পিচ-গলানো গাড়ি আর কাতারে কাতারে পিচের ড্রাম। দশ-বিশটা নয়, দেড়শো-আড়াইশো। তার মধ্যে আবার তেরোটা ফুটো— কালো থকথকে পিচ বোদে তেতে গলে গদগদ করে গড়াচ্ছে— টের পাওয়া যাবে না এমন চুপি চুপি গড়ায় ওরা। দ্যাখো না, গড়াতে গড়াতে ধরেও ফেলেছে একটা অন্যমনস্ক শুয়ে থাকা খয়েরী রোঁয়াওলা মোটাসোটা নেড়িকুত্তাকে। ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে দেখে উঠতে পারছে না, পিঠে কী যেন কামড়ে ধরেছে। জোর করে লেজ মাথা নেড়ে ঝাঁকিয়ে উঠতে গিয়ে কান আর লেজও আটকে গেল। তারপর ডিগবাজি খেয়ে উঠতে গিয়ে, ব্যাস, পা-ও জ্যাম। আর মওকা পেয়ে পিচ চার হাত বাড়িয়ে কুত্তাকে

আদরে সোহাগে ধরলে— কুত্তা যতোই চিল্লে মরুক, পিচ নাছোড়বান্দা। তারপর সে অ-নে-ক কা'ণ্ড— পিচের থেকে পাজি পাড়ার ছোঁড়ারা— সে আর কী শুনবে— দেখতেই তো পাচ্ছো মেডিকেল থেকে অ্যাসিডে ধোলাই হয়ে এসে কেমন দিব্যি ব্ল্যাক-অ্যান্ড-ব্রাউন ক্যালকেশিয়ানটি হয়ে পাঁঠার দোকানের সামনে কচিপাঁঠার শিং চিবোচ্ছে।

চলো, চলো, দেখবে চলো ছেলেটা কেমন খোলা পিচের ড্রামে একটা আধলা-ইঁট ফেলে একমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কতক্ষণে ইঁটটা পুরো ডুবে যায়। এ ছেলে নিশ্চয়ই পরে বৈজ্ঞানিক কিংবা কবি হবে। আর ঐ যে দেখছো মেয়েটা ভাঙা খুন্তি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পিচ মাটির সরায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে ফুটো বালতি সারাবে বলে— ও বড়ো হয়ে নির্ঘাৎ চোর হবে।

যাঃ পিচের ড্রাম গেল কোথায় ?! সব ফাঁকা— বিলকুল। তবে, তাহলে ?

তাহলে আর কী! তালপাতার পুঁথির বারমাস্যায় দেখে নাও কবে আসবে বাঁশের তেকোণা মানুষ-সমান কেয়ারি যা তোমাদের ফুটপাথে ফুটপাথে বনমহোৎসবে লাগানো নিম-অশোক-কৃষ্ণচূড়ার চারাগুলোকে বাঁচাবে। 'আসবে' বলা ভুল হলো ; ওরা এখানেই জন্মাবে। প্রথমে আসবে ঠেলা-বোঝাই সবুজ নরম বাঁশ, তারপর দা-কুড়ুল হাতে কারিগর, তারপর তার পেরেক, তারপর জাল। সকাল দুপুর বিকেল ধরে চলবে দুটো কি তিনটে কারিগরের খুটখাট ঠুকঠাক। গাছের ছায়ায় বসে একটু একটু করে কাজ করবে আর পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে একটা একটা বিড়ি খাবে, আবার কাজ করবে, আবার বিড়ি খাবে। মনে হবে যেন এরা একমনে তাজমহল গড়ছে। হয়তো ওদের কাছে তাই-ই। তবে কদিন পরে দেখবে দুটো চারটে করে একসময় গোলদীঘির এইখানটায় সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল ফর্সা ফর্সা টাটকা বাঁশের চকচকে জাল ঘেরা তেকোণা কেয়ারি। কালো কালো গোবদা গোবদা পিচের ড্রামগুলো যেমন বিতিকিচ্ছির, এগুলো তেমনি ফাইন— এতগুলো একজায়গায় ভিড় করে রয়েছে অথচ মনে হবে যেন কিছুই নেই।

তারপর সত্যিই একদিন কিছুই নেই। সব হাওয়া। কখন যে কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলা গাড়ি সাফসুতরো হয়ে এসে কেয়ারিগুলোকে গায়েব করলে টেরই পাওয়া গেল না।

গোলদীঘির এইখানটা আবার ফাঁকা। পড়ে রইলো শুধু বাঁশের কয়েকটা এবড়ো-খেবড়ো গাঁট আর মচকানো তলতার টুকরো।

কিন্তু ফাঁকা কদিনই বা! কালও বিকেলে বেড়াতে এসে তুমি ঐ ফাঁকায় সন্ধের ঝোঁকে হিসি করে গেছিলে না ? আজ দ্যাখো বালির পাহাড়। একটা নয়, তিন চারটে। আর সেই সংগে দুটো লাল লাল খোয়ার আর কালো কালো গিটির মালভূমি। মাঝে-মাঝে উপত্যকা। আর যে-যার কাজে লেগে গেছে। দশ-বারোরা পর্বতাভিযান শুরু করে দিয়েছে আর মালভূমি টু-মালভূমি লংজাম্প। ঐ দ্যাখো ঐ দ্যাখো বালির পাহাড়ের নিচে বসে ক্ষুদে রাজা কেমন দিব্যি তার দুর্গ বানিয়ে ফেলেছে। আর,

মেয়েদুটো দুদিক থেকে কেমন একটু একটু করে খুঁড়ে খুঁড়ে এগোচ্ছে টানেল বানাতে বানাতে— বোধহয় ওই টানেল দিয়ে ওদের দেশলাই বাক্সর রেলগাড়ি চলবে।

দাঁড়িয়ে পড়লে তো জলের দিকে পেছন করে রেলিং-এ পিঠ দিয়ে। দাঁড়াও দাঁড়াও ; দ্যাখো দ্যাখো। দেখতেই হবে তোমায় গোলদীঘির এইখানটা।

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে পড়লো। গোলদীঘির সবচেয়ে উঁচু গাছদুটো— একটা পাম আরেকটা দেবদারু— পাল্লা দিয়ে মেঘ ধরতে বেড়ে চলেছে। মেঘও ধরা দিয়েছে। মেঘ একেবারে ঝুঁকে রয়েছে গাছের মাথায়, আর তিনদিন নাগাড়ে ঝমঝম ঝমঝম। পুকুর ভরলো, পাড় ডুবলো, রাস্তায় থৈ থৈ এক কোমর জল, বার-ভেতর সব একাকার, গোলদীঘির মাছ বঙ্কিম চ্যাটার্জী আর মির্জাপুর দিয়ে খেলে বেড়াতে লাগলো— আর, গোলদীঘির এইখানটা জলের তলায় জিরোতে লাগলো।··· বৃষ্টি ধরলো একসময়, জল নামলো, গু-মুত জঞ্জাল সব ধুয়ে সাফ ; প্রথমে চিটাচিটে তারপর ঝকঝকে আঙিনা বেরিয়ে পড়লো।

কদিন পরই স্যান্সক্রট স্কুল থেকে গোলদীঘি দিয়ে দুপুরে টিফিন খেতে এসে নীচ থেকেই ভোঁদর চেঁচিয়ে উঠলো "বাপঅ, বাপঅ, খুঁটি এসে গ্যাছে। সত্যি গো, আমি দেখে এলুম খুঁটি এসে গেছে।" "খুঁটি এসে গেছে ?!" বলেই ছুটলুম ছাতে। হ্যাঁ সত্যিই তো, খুঁটি এসে গেছে। লরি থেকে একটা একটা শালকাঠের লম্বা লম্বা খুঁটি নামিয়ে রাখছে পুকুরের রেলিং-এর ধারে। তাহলে আর দেরি নেই !! ছুটে নেমে গেলুম একতলায় প্রেসে। গোপীবাবু কাবাস ঢুলতে ঢুলতে কম্পোজ করছিল, চেঁচিয়ে উঠলুম "অ গোপীবাবু, অ কাবাস, হাত চালাও, হাত চালাও, গোলদীঘিতে খুঁটি এসে গেল যে ! 'কৌরব'-এর এখনো যে ছ' ফর্মা বাকি, 'অভিমান'-এর চার ফর্মা ! খুঁটি এসে গেলো, আর পুজোসংখ্যাগুলো বের করবো কবে !" আবার দোতলায় ছুটে এসে বউকে বলি "ভাগি, অ ভাগি পুজোর আর কতো দেওয়া বাকি বলো তো ? তুমি তো বলেছিলে এবার পুজো খরচা আড়াই হাজার লাগবে। কতটা দিয়েছি তোমাকে ? অ্যাঁ, এখনও আটশো বাকি ! আর এদিকে খুঁটি এসে গেল !! উঃ কী করে যে ম্যানেজ করবো··· !" বিকেলে আর-জি-কর থেকে ক্লাশ করে হাজিরা দিতে আসতেই সিঁড়ির মুখেই ঘোষণা করি "ভুটান, খুঁটি এসে গেছে— আরে হ্যাঁ গোলদীঘির প্যান্ডেলের খুঁটি এসে গেছে।"

তারপর গোলদীঘির এইখানটা আস্তে আস্তে রবীন্দ্রসদন হয়ে গেলো কিংবা অকাল তথত্ স্বর্ণমন্দির। সদন ? হ্যাঁ সদনই তো— আনন্দ সদন। মন্দির ? হ্যাঁ মন্দিরই তো— দুর্গা মন্দির। একমাস ধরে সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে রাত্তির কেউ না কেউ হাঁ করে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে দেখছে চাঁদোয়া কী চেহারা নিচ্ছে, ঝাড় কীভাবে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে ওপরে উঠবে।··· তারপর একদিন মাঝরাত্তির দুটো / তিনটের সময় হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে যে যার জায়গায় উঠে পড়লো রমেণ পালের মা-ছেলে-মেয়েরা।

তুমি তো গোলদীঘির এইখানটায় নিশ্চয়ই এসেছো। ভিড়ের ঠেলায় তুমি দাঁড়াবার ফুরসৎই পাওনি। হাত জোড় করে বুকের কাছে ধরাই ছিল, যথাস্থানে একবার ঠক্ করে কপালে ঠুকেও দিলে— কিন্তু ঢোকা থেকে বেরোনো পর্যন্ত তুমি হাঁ করে চোখ কপালে তুলে ঘাড় কাৎ করে দেখে গেলে কলকার বাহার ঝাড়ের বাহার আয়নার ঝিকিমিকি। বেরিয়ে তোমার হুঁশ হলো ঠাকুর দেখাই হয়নি। পেছন ফিরে দেখতে গিয়েও তোমার দেখা হলো না— পেছনের চাপে তুমি দুর্গা থেকে দূরে আরও দূরে সরে যেতে লাগলে— কানে শুধু শুনতে পাচ্ছো মাইক চেঁচাচ্ছে "মণ্ডপের মধ্যে অযথা ঠেলাঠেলি করবেন না, অযথা দাঁড়িয়ে থাকবেন না, পিছনের অগণিত দর্শনার্থীদের মাতৃদর্শনের সুযোগ করে দিন···।

এইখানটা খালি করে একদিন তেনারা লরী আর ট্রাল চেপে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে ঘরে পেঁচা নিয়ে একরাত্তিরের জন্যে তিনি এলেন এবং পরদিন চলেও গেলেন— অবশ্য যদি না সেবারের মতো সত্যি পেঁচা এসে পড়ে।

মনে নেই তোমার! তুমি তো তখন তত ছোট নও যে মনে থাকবে না। এই তো ক'বছর আগের কথা। নবমীর দিন যেদিন প্যান্ডেল ধূ ধূ হলো অথচ প্রতিমার গায়ে একটু আঁচ লাগলো না, একফোঁটা জল লাগলো না—সেবার নয়। তারই লাগোয়া লাগোয়া একবার। মনে পড়ছে না— সেই যে কোজাগরীর সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ দেখা গেল এক লক্ষ্মীর দুই পেঁচা! কী ব্যাপার কী ব্যাপার! চোখে দেখার ভুল! দু-চারজন করে লোক জমতে লাগলো— সবাই দেখলে লক্ষ্মীর পেঁচার পাশে আর একটা পেঁচা। এবং একটু পরেই বোঝা গেল সেটা গোখ পিটপিট করছে আর হৈ চৈ বাড়লেই লক্ষ্মীঠাকুরের পেছনে ঘাপটি মারছে। ব্যাস, গ্রামে গ্রামে সেইবার্তা রটি গেল ক্রমে। পাড়া থেকে পাড়া, উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা, খবরের কাগজ মারফৎ জেলায় জেলায়। লক্ষ্মী প্যান্ডেলে অলটাইম রেকর্ড ভিড়, লক্ষ্মীমায়ের বাসি থাকার অলটাইম রেকর্ড! আলোটালো গোলদীঘির চারপাশ থেকে গাছপালা থেকে খোলা হয়ে গেছিল, আবার লাগানো হলো, মাইক সেই দুর্গা ভাসানের দিনই সরে গেছিল সেগুলো আবার ফিরে এল। সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে রাত শোনা যেতে লাগলো— "আস্তে···আস্তে···আপনারা আস্তে আস্তে এগোন···চেঁচামেচি করবেন না···খুব বেশি আঙুল দেখাবেন না— পেঁচা চমকে যাবে, পেঁচা পালিয়ে যাবে, পালিয়ে গেলে আপনার পিছনের অগণিত দর্শক এবং বাংলা তথা ভারতের দূর প্রান্ত থেকে যাঁরা রওনা হয়েও এখনও পেঁছিতে পারেননি তাঁরা পেঁচা দর্শনে বঞ্চিত হবেন। আপনারা ধীরে ধীরে পেঁচা দেখে চুপচাপ বেরিয়ে যান। সামনে এগোন, সামনে এগোন।"

সত্যিই অবাক করা কাণ্ড। ক'দিন নাগাড়ে সত্যি পেঁচা মাটির পেঁচার সংগে ভাব করার জন্যে তার গায়ে গা লাগিয়ে ঠায় বসে রইল। যেন পোষা পেঁচা। এমনকি পুরুতমশাই ভরসা করে যখন তার কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দিলেন, সেও আহ্লাদে

গদগদ হয়ে টিপ পরে নিলে। মধ্যে মধ্যে সকলের মাথার ওপর দিয়ে হুঁশ করে উড়ে বেরিয়ে যেতো— অমনি গেল গেল রব, হুলুস্থুলু— কিন্তু আবার খানিকপরে সেইরকমই হুশ্ করে ঢুকে পড়ে আবার পেঁচার পাশে পেঁচা বসে পড়তো।

যতই তাক্ লাগুক, কালীপুজোওলাদের মাথায় হাত। প্যান্ডেল খোলা যাচ্ছে না অথচ দেওয়ালী গুটি গুটি এসে গেল বলে। যাই হোক সেবার যথাসময়েই যথাবিহিত কালীপুজো হয়েছিল।

কালীপুজো! এই কালীপুজো। সম্মিলিত সার্বজনীন শ্রীশ্রীকালীপুজা, কলেজ স্কোয়ার। অর্থাৎ আবার এলে গোলদীঘির এইখানটায় তুমি।

কোজাগরী থেকে দেওয়ালী মাত্র পনেরো দিন। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলে স্বর্ণমন্দির নামানো হলো এবং আকাশবাণী ভবন উঠে দাঁড়ালো। পশ্চিমমুখো দশভুজা দক্ষিণমুখী শ্যামা হলেন যাঁর 'মাথার সোনার মুকুট ঠেকেছে গগনে'। রামকুমার শ্রীকুমারের সুরের নক্সা, সবিতাব্রতর বুক কাঁপানো ডাকের তুমি সাক্ষী রইলে, শিউরে উঠলো রাত দুটোয় যখন মাইকে গমগম করে উঠলো পার্বতীচরণের ওঁ হ্রীং শ্রীং দক্ষিণাকালীকায়ৈ নমঃ,…ওঁ হ্রীং শ্রীং…ওঁ হ্রীং শ্রীং। পরম সেই ওঙ্কারধ্বনি দীপাবলীর আলোয় আলোয় ঝলমলে আকাশে হাউই-রকেটের ফুল ফোটানোর পাশ দিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো পাড়ার প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি ঘরের প্রতিটি সংসারের নিদ্রিত-জাগ্রত মানুষের মাথায় মাথায় আশীর্বাদের ফুলঝুরি হয়ে। ভোর যখন হয় হয় তখন পুষ্পাঞ্জলি প্রণাম মন্ত্র জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী উচ্চারিত হলো ঠিক সেই-ই সময় যখন ঠিক একমাস আগে রেডিওয় 'বাজলো তোমার আলোর বেণু'।

দাঁড়াও। যেওনা গোলদীঘির এইখানটা থেকে। যাদিও-বা যাও, পরের তিনদিন সন্ধ্যারাতির সময় এসো। প্রথাসিদ্ধ ঘটাবসর্জন পরের দিন যথাযথ হলেও প্রতিমা এখনও কদিন থাকবেন। এসো সন্ধ্যারাতিতে। দেখো, যখন ধুনোর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যাবে এইখানটা কানন আর দীপকের ধুনুচি নাচের তালে তালে, শ্যামল যখন দু'বাণ্ডিল ধূপ জ্বালিয়ে দু'হাত উঁচু আরও উঁচু করে তুলে ধরবে, রবি আর পার্থ যখন ঢাকির হাত থেকে কাঠি কেড়ে নিয়ে সঠিক পিটে যাবে জোড়া ঢাক, আর শংকর বাজাবে কাঁসি তখন— ঠিক তখনই কালো পাগল মানিক চোখে জল চওড়া পাঞ্জায় দু'হাতে তালি দিয়ে দিয়ে জয় মা জয় মা করে এগোবে আর পেছোবে তখন— ঠিক তখনই তুমি দেখো— দেখতে পাবে— সেই শব্দগন্ধময় কুহেলীর ভেতর এই মুহূর্তে কালীমুখ, এই মুহূর্তে দুর্গামুখ; এই দুর্গামুখ এই কালীমুখ। আশ্চর্য! হ্যাঁ এই আশ্চর্যই তুমি দেখতে পাবে গোলদীঘির এইখানটায়।

এ প্যান্ডেলও একদিন খোলা হয়ে যাবে। আঁধার হয়ে থাকবে গোলদীঘির এইখানটা। শুধু সেই না-পাম, না-তাল, না-খেজুর গাছে ঝুলতে থাকবে নতুন ঘট এক বছরের মেয়াদে।

না, মন খারাপ করার কিছু নেই। কদিন বাদেই মানে মাস দেড়েকের মধ্যেই দেখবে এখানেই ছোট মাপের সামিয়ানা খাটানো হলো আর শুরু হলো 'ফুলের-জলসা'। দেখতে চাও তো এসো কতো বড়ো বাঁধাকপি হতে পারে, বুড়ো বটগাছ কতো ছোট হতে পারে, কতদিন থাকতে পারে একটা ডালিয়া। বাচ্চাদের হাত ধরে ভেতরে ঘুরে ঘুরে দেখো কোন্ গোলাপ কোন্ চন্দ্রমল্লিকা কোন্ প্রাইজ পেলো। চার-পাঁচদিনের বেশী এ-জলসা চলবে না ; তার মধ্যেই এসো কিন্তু।

হ্যাঁ, আবার অন্ধকার। আবার ফাঁকা। আবার কুয়াশার কাঁথামুড়ি। আবার দেবদারুর ঝরা পাতার ওড়াউড়ি।

তারপর যখন উন্মনা ফাল্গুন এসে পড়বে, আবার বাঁধা হবে ছোট একটা প্যান্ডেল —খুব সাদাসিধে। সারা জমিটা জুড়ে পাতা হবে সতরঞ্চি। ডাকের সাজের সিংহাসনের সামনে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তিকে প্রণাম করে ব্রাহ্মমুহূর্তে বেহালার ছড়ের টানে, হারমোনিয়ামের চাবির চাপে, খঞ্জনীর টোকায় আর খোলের বোলে শুরু হবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বার একজপ 'হরে কৃষ্ণ··· হরে রাম···'। সেদিনটা অবশ্যই হতে হবে শিবরাত্রি। সারারাত ধরে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে আস্ত একখানা আদি অকৃত্রিম বঙ্গদেশ এসে হাজির হবে গোলদীঘির এইখানটায়— নামগানে, উলুধ্বনিতে, মালা-চন্দনে। এমনকি ছেদহীন চব্বিশপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তনের দ্বিতীয় রাত্রে যখন শিবরাত্রির জাগরণক্লান্ত বেশিরভাগ শ্রোতা নারীপুরুষই নিজের নিজের বাড়িতে ঘুমোবে, মাত্র কয়েকজন বুড়ি বিধবা আর বুড়ো আর উদ্যোক্তাদের দু'চারজন খোঁড়ার নাচ দেখতে দেখতে নাম শুনতে শুনতে ঢুলে ঢুলে নিজের অজান্তেই সতরঞ্চির ওপর এলিয়ে পড়বে, যখন সেই গহন রাতে বাসন্তী হাওয়ার টানে বাঁশি আর বেহালা একসুরে কৃষ্ণ অ-অ-অ বলে কেঁদে উঠবে তখন কী মনে হয় জানো— তখন মনে হয় কোন্ সুদূরে অতীত থেকে অনাদি অনন্ত বাঙালীর প্রাণের ডাক শহর গ্রাম নদী মাঠ জলা জঙ্গল ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে কোথা থেকে কোথা। আর সেই অনাদি অনন্তর মাঝখানে তুচ্ছ আমাকে তোলপাড় করছে 'সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে··· জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী ·· হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে'। সর্বএক— সব একাকার— সব এক।

জানো তুমি, কিছুদিন আগে আমি 'ভারততীর্থ' বলে একটা তীর্থ দর্শনের গাইড বুক কিনেছি। ভারতের সমস্ত তীর্থ সম্বন্ধে নানান খুঁটিনাটি তাতে দেওয়া আছে। খুব ভালো বইটা। সেই বইটার শেষ পাতায় আমি কলম দিয়ে ছোট ছোট করে লিখে নিয়েছি : আমার জন্ম-জন্মান্তরের তীর্থ গোলদীঘির এইখানটা। □